সুরাইয়া খানম

সমগ্র

কবিতা
অনুবাদ
গদ্য
সাক্ষাৎকার

হো চি মিন

সংকলন ও সম্পাদনা
মুহিত হাসান

KOBI PROKASHANI

সুরাইয়া খানম সমগ্র
সংকলন ও সম্পাদনা : মুহিত হাসান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
কবি পরিবার

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৫০০ টাকা

Collected Works of Suraiya Khanum Compiled and Edited by Muhit Hasan Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: August 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 500 Taka RS: 500 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99332-5-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

ভূমিকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সুরাইয়া খানম তাঁর একটি কবিতার নাম রেখেছেন, 'আমি আজও সম্পূর্ণ সুরাইয়া হয়ে উঠিনি'; তাঁর এই উক্তিতে সত্য আছে এই অর্থে যে তিনি থেমে থাকেননি, এগিয়ে গেছেন; তবে তাঁর ওই উক্তি যে যথার্থ সেটাও বলার উপায় নেই; কেননা একেবারে শুরু থেকেই তিনি নিঃসন্দেহে সুরাইয়া খানমই। তাঁর যে কোনো রচনা পড়লেই বোঝা যাবে যে সেটি ভিন্ন রকমের; কথা সেখানে অন্য ধরনের, অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন স্বতন্ত্র, এবং রচয়িতার তৃষ্ণাও তাঁর একেবারেই নিজস্ব। সুরাইয়ার কবিতার বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আছে। অনেক রকমের এবং নানান ধরনের বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন, এবং যা-ই লিখেছেন তাতেই তিনি মৌলিক। সুরাইয়ার কবিতা তাঁর জীবনেরই অংশ। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, কবিতা তিনি লিখেছেন না-লিখে উপায় ছিল না বলে। কেউ যে উৎসাহ দিয়েছেন বা অনুপ্রাণিত করেছেন তা নয়; বরং বিরোধিতাও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে— বাইরে থেকে যেমন, তেমনি পরিবারের ভেতর থেকেও। কিন্তু তিনি ছিলেন অদম্য, কারণ তাগাদাটা এসেছে একেবারে ভেতর থেকে; তাঁর নিজের ভাষায়, না লিখলে "মাথা ধরে, অসহায় বোধ হয়, দম বন্ধ হয়ে আসে।"

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর সাফল্য ছিল; কষ্টও ছিল। কষ্টের অমরতার উল্লেখ রয়েছে তাঁর কবিতায়। বেদনা থেকেই তিনি লিখেছেন। আসলে সেটিই ঘটে; কবিতা তো অবশ্যই, সকল শিল্পসৃষ্টিরই উৎস হচ্ছে শিল্পীর নিজের অন্তর্গত বেদনা ও অসন্তোষ। সুরাইয়া খানম বেদনায় পিষ্ট ছিলেন। পীড়িত ছিলেন তিনি অসন্তোষেও। তাঁর লেখায় আর্তনাদ আছে, কান্নার পূর্ব-মুহূর্তও পাওয়া যাবে; কিন্তু কান্না নেই, কারণ জীবনে যেমন কবিতাতেও তেমনি, তিনি ছিলেন দুর্দমনীয় রূপে আশাবাদী।

এক অর্থে তাঁর সকল কবিতাই আত্মজৈবনিক। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছেন, সেখানে মিথ্যার বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় নেই। কবিতাতেই তো বলেছেন তিনি যে মিথ্যা বললে কথারা কলঙ্কিত হয়। অমন কলঙ্ক তাঁর রচনাকে স্পর্শ করেনি। অন্যদিকে নেই বাগাড়ম্বর। উচ্চারণ যেখানে মর্মস্পর্শী, ব্যথার ভারে কাতর, সুরাইয়া খানম সেখানেও সংযত এবং নান্দনিকতা-বোধে সুশাসিত।

একই সঙ্গে তিনি অনিবার্যরূপ আন্তরিক। আন্তরিকতা শিল্পের জন্য খুব বড় একটা মূলধন। ওই বস্তুতে এই কবির রচনা আগাগোড়া সমৃদ্ধ। কিন্তু কেবল আন্তরিকতাই

যে শিল্প সৃষ্টি করে তা তো নয়, প্রয়োজন হয় মেধার এবং আবেগের। সুরাইয়া খানমের মেধা যেমন তাঁর শিক্ষার্থী-জীবনের ঈর্ষণীয় সাফল্যে দেখা গেছে, তেমনি তা কার্যকর ছিল তাঁর সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রেও। দেশী-বিদেশী ধ্রুপদী এবং আধুনিক সাহিত্য তিনি অনবরত পাঠ করেছেন; এবং পাঠের অভিজ্ঞতা যথাযথ রূপে কাজে লাগিয়েছেন। অদম্য আবেগ এবং সক্রিয় মননশীলতা একত্র হয়েছে—যেমন তাঁর জীবনচর্চায় তেমনি সাহিত্যসৃষ্টিতে। আর ছিল শ্রম। শ্রম ছাড়া যে সৃষ্টি নেই, এবং সৃষ্টিতে যে উল্লাস রয়েছে, এই দুই খবরই সুরাইয়া খানমের লেখার ভেতর পাওয়া যাবে। রচনার সাবলীলতা ও সজীবতা দেখে মনে হবে যে এরা স্বতঃস্ফূর্ত। হ্যাঁ, স্বতঃস্ফূর্তই বটে। কিন্তু পেছনে আছে শ্রম। ওই শ্রমের কারণেই বক্তব্য নান্দনিক হয়েছে। তিনি জানতেন যে রোম শহর একদিনে গড়ে ওঠেনি; বাগানের ফুলও রাতারাতি ফোটে না; সেই সচেতনতা যে তাঁর সৃষ্টিশীলতার ভেতরেও ছিল সেটা টের পাই তাঁর লেখার সংগঠনে ও সৌকর্যে। যথার্থ শব্দের তিনি যথাযথ ব্যবহার করেছেন; পুরাতন শব্দকে নতুন করে তুলেছেন, অপরিচিত শব্দকেও সামনে নিয়ে এসেছেন। প্রয়োজনে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারেও দ্বিধা করেননি। অনেকসময়েই তাঁর ভাষা গানের মতো; আবার বিদ্রুপ, এমনকি ধমকও যে নেই, এমনও নয়; কিন্তু সে-ভাষা সকল সময়েই সুশ্রাব্য। কখনোই কর্কশ নয়।

সব মিলিয়ে সুরাইয়া খানমের নিজের একটি জগৎ ছিল, সেটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেরই সম্প্রসারণ, এবং সে জন্য মোটেই কৃত্রিম নয়, পুরোপুরি স্বাভাবিক। তাঁর ওই জগতে প্রধান সত্য মমতা। তিনি জানেন এবং কবিতার মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, মানুষ মাত্রেই মমতা অভিলাষী। এই মমতাই তাঁকে অবিচলিত ও সক্রিয় রেখেছে। তাঁর কবিতার জগৎটি ওই মমতার কারণেই বিশেষ ভাবে জীবন্ত। সুরাইয়ার ওই জগতে বিষণ্নতা রয়েছে, কিন্তু হা-হুতাশ নেই। কবিতাকে তিনি মনে করেন ‘সমাজদেহের অন্তর্গত চিৎকার’; কিন্তু সে চিৎকার বিলাপের নয়। তিনি লিখেছেন,

> আমি এক জলার্ত চিৎকারে ফাটি, বজ্র চাই,
> সৃষ্টি চাই, তরবারি চাই
> তোমরা শুধু দেখলে হাহাকার।
>
> (‘ভিন্ন দৃষ্টি’)

ব্যক্তিগতভাবে আমরা যাঁরা তাঁকে চিনতাম তাঁদের জানা ছিল তিনি কাজেকর্মে-কথাবার্তায় কেমন সপ্রতিভ ছিলেন। ওই সপ্রতিভতা তাঁর কবিতাতেও রয়েছে। কিন্তু এটা তিনি জানতেন যে, সব কথা সহজে কথা হয় না। জীবনকালে প্রকাশিত তাঁর একমাত্র কবিতার বইটির তিনি নাম দিয়েছিলেন ‘নাচের শব্দ’। ওই নামকরণ বড়ই যথার্থ। তাঁর কাব্যে শব্দ আছে। বস্তুত তাঁর কবিতার জগৎটি শব্দে মুখরিত। কিন্তু সে মুখরতা হট্টগোলের অট্টরোলের নয়; সেটি গানের। তাঁর কবিতার শিরোনামে দেখি বার বার গান ফিরে ফিরে আসে, এবং কবিতার ভেতরেও গান উপস্থিত থাকে। সেই

গান তৈরী হয় শ্রমে, যদিও শ্রমের চিহ্ন ওই গানে কখনো পড়ে না। তাঁর গান অন্য মানুষেরও গান। যারা শোনে তারা অংশীদার হয়ে যায়। সুরাইয়ার কবিতায় দেখি প্রকৃতিও গান গায়; কিন্তু তিনি প্রকৃতির কবি নন, কবি তিনি মানুষের। মানুষের গান প্রকৃতিও শোনে, এবং শুনে সাড়া দেয়।

এটা তো জানা কথাই যে, কোনো সাহিত্যই মহৎ হয় না দার্শনিকতা ছাড়া। সুরাইয়া খানমেরও একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সেটি হলো মনুষ্যত্বের পক্ষে, এবং মনুষ্যত্বের শত্রুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর। একালে মনুষ্যত্বের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে পুঁজিবাদী উন্নয়ন এবং উন্নয়নের বাণিজ্য। এর বিরুদ্ধে তিনি তাঁর নিজের মতো করে সবাক। এবং অনড়।

বলেছিলাম যে, সুরাইয়া খানমের সব কবিতাই আত্মজৈবনিক। তিনি যখন পেরেক বা সেফটিপিনকে নিয়ে লেখেন তখনও নিজের কথাই বলেন। কিন্তু তাঁর আত্মজৈবনিকতা তাঁকে আত্মনিমগ্ন করে না, তিনি আত্মকরুণায় ভোগেন না। নিজের বেদনার কথা যখন তিনি অন্যকে জানাতে চান তখন নিজেকে প্রসারিত করে দেন, পৌঁছে যান বেদনার্ত মানুষের হৃদয়-দুয়ারে। এর বড় কারণ মমতা, যেটা করুণা থেকে একেবারেই ভিন্ন।

এই মমতাই তাঁকে দেশপ্রেমিক করেছে। সুরাইয়া খানমের জন্য এটা কেবল স্বাভাবিক নয়, অনিবার্যই ছিল যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তিনি থাকবেন। সুরাইয়া তখন লন্ডনে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি করেছেন; যুদ্ধ শুরু হওয়ার খবর পাওয়ামাত্রই প্রবাসীদের যে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগটি গড়ে উঠেছিল তাতে তিনি যুক্ত হন। শেফিল্ড শহরে আয়োজিত বড় এক জনসভায় তিনি রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতাটি আবেগের সঙ্গে আবৃত্তি করেন। 'প্রশ্ন' কবিতায় মনুষ্যত্ববিনাশী মানবদেহী প্রাণীদের বর্বরতার বিরুদ্ধে যে ধিক্কার রয়েছে সেটি ছিল সুরাইয়া খানমের নিজের প্রাণের ভেতরও। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন কেবল প্রশ্নই ছিল না, প্রশ্নের ভেতর জবাবটাও ছিল; বলা হয়েছিল যে ওই অন্যায় সহ্য করা যাবে না। অন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের যে সংগ্রাম সেটা সুরাইয়া খানমের অভিজ্ঞতার এবং কবিতারও অংশ বটে। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর সার্বিক অবস্থানেরই অংশবিশেষ।

আর ওই দেশপ্রেমের কারণেই যুদ্ধশেষে তিনি আর বিলম্ব করেননি, অতি দ্রুত দেশে ফিরে এসেছেন। প্রথম জীবনে পিতার চাকরীর কারণে অনেকটা সময় কেটেছে করাচীতে, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছেন, তার পরে কমনওয়েলথ বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে গেছেন। সব মিলিয়ে ১৩ বছর প্রবাসে কাটিয়ে সুরাইয়া খানম দেশে ফিরেছিলেন। হৃদয় ভরা ছিল সৃষ্টিশীলতার স্বপ্ন; স্বপ্ন ভরপুর ছিল আশায়।

কিন্তু দেশে যা ঘটেছে তা আমরা প্রত্যেকে যেমন দেখেছি তেমনি দেখেছেন সুরাইয়া খানমও। তাঁর 'চারণের গান' কবিতায় শোনা যায় :

> পথে প্লেগ, পাগলা কুত্তা, তাবৎ টিটকারি
> পথে ক্লেদ, পথে ক্লেশ, যন্ত্রণার জীর্ণ জারিজুরি

পথে রোদ, পথে ধূলো, পথে তীক্ষ্ণ ঝড়ের গিটকিরি
পথে স্বেদ, পথে খেদ, পথে দীর্ঘ কঙ্কালের সারি
পথে ক্রোধ প্রতিশোধ প্রেতাত্মার আহাজারি ভারি

এগুলো সবই অবাঞ্ছিত, কিন্তু যা তিনি ভীষণভাবে ঘৃণা করেন সেটি হলো প্রতারণা। খঞ্জকে তিনি খঞ্জ বলেন না, খণ্ডকে বলেন না খণ্ড, অন্ধকে বলেন না অন্ধ; কিন্তু ভণ্ডকে বলেন ভণ্ড। তাঁর জগতে হলদে লতাও কথা বলে; কবির পক্ষ হয়ে জানায় “জড়ভরত নিমকহারাম শুঁয়োপোকা পিঁপড়ে যত/কামড়ে আমায় খেয়েছে, বুকে আমার ক্ষত”। নিজে তিনি জানেন বাঁচতে হলে খাজনা দিতে হয়; হিসাব মিলাতে গিয়ে দেখেন হাতে কিছু নেই; চলতে গিয়ে টের পান পথে বিছানো রয়েছে মোহ, মোহ থেকে মুক্তির জন্য চাই শক্তি। প্রেমিককে বিশ্বাস করেন না, জানেন সে-লোক পদ্মপুকুরে সাঁতার কাটতে আসে, উঠে চলে যাবে বলে। তিনি আশ্রয় চান, দরকার মনে করেন শুশ্রূষালয়ের; কিন্তু জানেন তা পাবেন না। তবু আশা রাখেন মানুষের মনুষ্যত্বে। এবং এটাও জানেন যে, রোম শহর একদিনে গড়ে ওঠেনি, পুষ্পও রাতারাতি ফোটে না। আস্থা আছে তাঁর নিজের ওপর। এবং সে কারণে তিনি কেবল আত্মবিশ্বাসী নন; আত্মশ্রদ্ধাশীলও। শ্রদ্ধা করেন নিজেকে। আর ছিল জেদ। যেটি না থাকলে শুরুতেই থেমে যেতে হতো।

বিদ্যমান ব্যবস্থাটা যে পুঁজিবাদী তা তিনি জানেন; যদিও সে-ভাবে তাকে চিহ্নিত করেননি। তিনি বাণিজ্যওয়ালাদের বিরুদ্ধে, যাদের আচরণ মাংসবিক্রেতা কসাইয়ের মতো। তাই তিনি বিদ্রোহ করেন, দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলতে চান। তবে তাঁর বিদ্রোহ ভিন্নধর্মী। সেটা মমতায় পরিপূর্ণ। সুরাইয়া খানম লিখছেন, বিদ্রোহ শুধু ‘বীরভাবে’ ঘটে না; তার জন্য আরও কিছু উপাদান প্রয়োজন। তাঁর উপলব্ধিটা এ রকমের যে, বিদ্রোহের জন্য দরকার হয় সেবার, আত্মত্যাগের, মহান প্রেম-প্রীতির এবং বিশ্বাসের। বিদ্রোহ শুধু ঠোকাঠুকি নয়; বিদ্রোহে ‘ভ্রুকুঞ্চনের শিখা’র পাশাপাশি থাকে সংযোজন ও সংগঠন, এবং সেই সঙ্গে ‘ক্ষমার ঢেউ’। তাই তিনি বলছেন, “লিপিকার আমি, অস্ত্র তুলি লিখিলাম আমি/ঐকেতরে কহি মানুষ মমতার অভিলাষী।” ক্ষমতার নয়, কর্তৃত্ব চান তিনি মমতার।

এই সংগ্রামে তিনি প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত :

যে পারে পারুক নিক পেতে বুক দাসত্বের এই ছররা
যে পারে করুক গ্লানি ভুলবার হল্লা,
যে পারে তুলুক মুখোশ ও দাঁড়িপাল্লা,

আমার তো আছে অমল ধনুক, অনড় শপথ
হারিকিরি, শুধু হারিকিরি কোরে মরবার।
(‘হারিকিরি শপথ’)

সুরাইয়া খানম নিয়তিবাদী নন, কিন্তু নিয়তির চেয়েও বড় যে শক্তি বিশ্বে এখন কার্যকর সেটির মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়েছে।

তাঁর সংগ্রামটা ছিল পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধেও; এবং পিতৃতান্ত্রিকতা যে আপাতত অপরাজেয় সেটা প্রমাণিত হয়েছে—অন্য অনেক ক্ষেত্রে যেমন, তাঁর ক্ষেত্রেও তেমনি। আবহমান দেশের, এবং আবহমান মাতৃস্নেহের কথা বারংবার এসেছে তাঁর কবিতায়; কিন্তু সন্দেহ কী যে সমসাময়িক বাস্তবতা অনেক ক্ষমতাবান আবহমানের তুলনাতে।

'লং ডিসট্যান্স রানার' নামের একটি কবিতায় সুরাইয়া জানিয়েছেন যে তিনি সীমানায় আটক থাকবেন না, পার হয়ে যাবেন। স্বাভাবিক আন্তরিকতায় তিনি জানাচ্ছেন, 'ঐতিহাসিক কলোনিয়ান ফ্রন্টিয়ার' অতিক্রম করে তিনি চলে যাবেন তাঁর 'সুদর্শনা অপরূপা মাতৃভূমিতে।' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৮ সালে। ২০০৩ সালে প্রয়াত কবি শহীদ কাদরীকে স্মরণ করে সুরাইয়া লিখেছিলেন, "জেনো হে বাঙালি, জেনো, হয়েছে শহীদ/সে যে কবিতার সঙ্গী হয়ে ঝাঁপিয়ে উঠেছে/আহত অশ্বের মতো বন্ধনের বিপরীতে/মুক্তি তাঁরই অক্ষরমালায় দীপ্ত।" করুণ বক্রাঘাতটা এখানে যে এই পঙ্‌ক্তিগুলো লেখার তিন বছরের মধ্যেই সুরাইয়া খানম নিজেও বিদায় নেন এই পৃথিবী থেকে; শহীদ কাদরীর মতোই, দূরদেশ আমেরিকাতে অবস্থানকালে।

কবি হিসেবে শহীদ কাদরীর সঙ্গে সুরাইয়া খানমের তুলনা করাটা অপ্রয়োজনীয়, সত্য তো এটাই যে তাঁরা স্বতন্ত্র ছিলেন একে অপরের থেকে; কিন্তু তবু মিল আছে দুই কবিতে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সে-সাদৃশ্য। শহীদ কাদরীর শৈশব কেটেছে বড় শহর কলকাতায়, সাতচল্লিশের 'কলোনিয়াল' দেশভাগের ফলে তাঁকে ছোট শহর ঢাকায় চলে আসতে হয়েছিল; আর একই রাজনৈতিক ঘটনার দরুন পূর্ববঙ্গের মেয়ে সুরাইয়া খানম চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন বড় শহর করাচীতে, তারপরে ইংল্যান্ডে। সুরাইয়ার মতোই শহীদ কাদরীও ছিলেন মাতৃভূমির দায়বদ্ধ প্রেমিক। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে দু'জনেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার পরে কাদরীকে চলে যেতে হলো জার্মানীতে, তারপরে লন্ডন হয়ে আমেরিকাতে। সেখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, এবং দেশে আর ফেরা হলো না। সুরাইয়াকে মনে হয়েছিল বিপরীত পথের যাত্রী। হৃদয়ভরা আশা নিয়ে একাত্তরের পরে তিনি দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু দ্রুতই তাঁর আশাভঙ্গ শুরু হলো, এবং ১৯৮২-তে কাদরীর মতোই তিনিও চলে গেলেন ওই আমেরিকাতেই। সেখানে গিয়ে এমএ এবং পিএইচডি করলেন, অধ্যাপনা শুরু করলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁরও আর দেশে ফেরা হলো না। শহীদ কাদরীর মতো তিনিও ইম্পেরিয়ালিস্ট আমেরিকাতেই রয়ে গেলেন, এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করলেন। সুরাইয়া লিখেছেন, 'সময় সময়েরই দাস'। সে-কথার সত্যতা প্রমাণিত হলো। ঘটনা দু'টি কেবল মেধাপাচারের নয়, আহত অশ্বের মৃত্যুরও শুধু নয়; তাদের তাৎপর্য হলো এই যে, জয়ী হয়েও বাংলাদেশ জয়ী হয়নি। হেরে গেছে সে পুঁজিবাদের কাছে। পুঁজিবাদ মানুষের স্বপ্নের হন্তারক বটে।

২.

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সুরাইয়া খানম প্রশ্ন করতে ভালোবাসেন; এবং তাঁর প্রশ্নের ভেতরেই উপ্ত থাকে প্রশ্নের জবাব। এ ছিল তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের একটি পদ্ধতি। পদ্ধতিটা নাটকীয়। নাটকে দ্বন্দ্ব থাকে, থাকাটা অপরিহার্য; সুরাইয়ার কবিতাতেও দ্বন্দ্ব পাবো, সে-দ্বন্দ্ব নাটকীয় বটে, কিন্তু কখনোই, ভুলেও, অতিনাটকীয় নয়। প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যের দ্বান্দ্বিকতাকেই প্রকাশ করতে চাইতেন। প্রশ্নের পাশাপাশি রয়েছে সম্বোধন। পাঠককে তো বটেই, নিজের অনুভূতিকেও তিনি সম্বোধন করেন। ফলে অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতার একটি পরিবেশ তৈরী হয়, এবং পাঠকের কৌতূহলও জেগে ওঠে পরিণতিটা জানবার জন্য।

সুরাইয়া খানম কবিতা লিখেছেন যেমন মুক্তছন্দে তেমনি অন্ত্যমিলযুক্ত পঙ্‌ক্তিতেও, এবং তাঁর সকল কবিতাতেই অন্তঃমিল রয়েছে, শব্দের পাশে শব্দরা বসে নিজেদের মধ্যে ধ্বনিগত সমন্বয় সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর কখনো উচ্চগ্রামের নয়, সেটি কথোপকথনের। ওদিকে তাঁর বাইরের জগৎটা তো অতিনাটকীয় হয়ে উঠেছে, সেখানে হৈ চৈ চলে, উচ্চকণ্ঠে হুঙ্কার শোনা যায়, আর্তনাদও ভেসে আসে; সে-জন্য তাঁর কণ্ঠস্বরের পক্ষে জায়গা খুঁজে পাওয়াটাই কঠিন হয়ে পড়ে। আবার তিনি যদিও যাত্রী ছিলেন সর্বদাই, কিন্তু সঞ্চয়ী ছিলেন না কখনোই; যে জন্য তাঁর অনেক লেখাই অগ্রন্থিত অবস্থায় ছিল। ইসরাইল খান একটি ভালো কাজ করেছিলেন, অনেক পরিশ্রম করে তিনি ২০২৩ সালে সুরাইয়া খানমের কিছু অগ্রন্থিত কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। সেটা ছিল একটা জরুরী কাজও। কিন্তু তাঁর সংগ্রহেও কিছু কবিতা এবং অন্যান্য রচনা বাদ পড়ে গিয়েছিল। মুহিত হাসানের সংকলন ও সম্পাদনা সমগ্র সুরাইয়া খানমকে উপস্থিত করার অসমাপ্ত কাজটিকে সমাপ্ত করেছে। অগ্রন্থিত কবিতার সঙ্গে তিনি নয়টি অনুবাদ কবিতা, চারটি গদ্যরচনা এবং চারটি সাক্ষাৎকার উদ্ধার ও সংযুক্ত করেছেন।

সুরাইয়া খানম স্মরণযোগ্য কবি ও লেখক, তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবার ব্যাপারে মুহিত হাসান যে শ্রম, মনোযোগ ও সময় দিয়েছেন যে কোনো মাপকাঠিতে তা অসামান্য। প্রকাশনা সংস্থা কবি প্রকাশনী 'সুরাইয়া খানম সমগ্র' প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে একটি প্রয়োজনীয় ও জরুরী কর্তব্য পালন করেছেন। সংকলন-সম্পাদক মুহিত হাসান এবং কবি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী সজল আহমেদকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

২৮.৭.২০২৫

প্রবেশক

বাংলাদেশের সাহিত্য-পরিমণ্ডলে ব্যক্তি সুরাইয়া খানম (১৩ মে, ১৯৪৪-২৬ মে, ২০০৬) সম্বন্ধে যত কথা ও কলহাস্যের ফোয়ারা ছুটেছে, সে তুলনায় তাঁর কবিতা কিংবা অপরাপর সাহিত্যকীর্তি বিষয়ে আলোচনা দুর্ভাগ্যজনকভাবে কম; প্রায় শূন্যও বলা চলে। স্বদেশি পাঠক ও সাহিত্য-অনুরাগীদের বেশির ভাগই সুরাইয়ার কথা স্মরণে আনেন তাঁর কবিতার জন্য নয়, বরং আড্ডার হালকা চালের চটুল গল্পগাছা থেকে উদ্ভূত তাঁর কতিপয় ক্লিশে কল্প-প্রতিকৃতির কারণে। তাই সুরাইয়া খানম এখনও বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে শুধুই 'আবুল হাসানের প্রেমিকা' কিংবা কখনো-সখনো 'আহমদ ছফার উপন্যাসের চরিত্র' হয়ে থেকে গিয়েছেন।

কিন্তু সুরাইয়া খানম আমাদের এক মহান কবির 'অনুপ্রেরণার উৎস' নিছক নন, নন কোনো কথাকারের উপন্যাসের চরিত্রের নেপথ্যে থাকা প্রেরণামাত্র। ইতিহাস-গবেষক লরি জিমার সম্প্রতি *I'm Not Your Muse* (রানিং প্রেস, ২০২৫) শীর্ষক এক অভিনব গ্রন্থে তুলে ধরেছেন সেইসব নারীর কথা, যাঁরা জনপরিসরে ও কেতাবি ইতিহাসে স্রেফ কোনো খ্যাতনামা পুরুষ-প্রতিভার 'মিউজ' বা প্রেরণাদাত্রী হিসেবেই পরিচিত—কিন্তু তাঁদের নিজেদের অসামান্য প্রতিভা ও সৃজনকর্মের খবর হয় কালের ধুলোয় ঢেকে গেছে নয়তো নির্মম হাতে মুছে দেওয়া হয়েছে। বিপরীতপক্ষে, কোনো কোনো বিখ্যাত নারী-প্রতিভার সুখ্যাতির আড়ালে একইভাবে ধামাচাপা পড়েছেন তাঁর সৃজনদীপ্ত প্রেমিক কিংবা স্বামী। সুরাইয়া খানমকে নিয়ে তাই নতুনভাবে আলোচনার সময় এসেছে। না, কারও সাধনসঙ্গিনী হিসেবে নয়, কিংবদন্তির রূপেও নয়। খুঁজে নিতে হবে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ সুরাইয়া খানমকে। সারবত্তাময় তথ্য-উপাত্তের বদলে মুখরোচক জনকল্পনায় গড়ে ওঠা সুরাইয়া খানমের যে পূর্বনির্ধারিত রহস্যময় মুখচ্ছবি আজও আমাদের সাহিত্যজগতের পোর্ট্রেট গ্যালারিতে পরম বিশ্বাসে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে তা দূরে সরিয়ে এই মনীষার মুখরেখাকে দেখা দরকার নতুন চোখে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে, ১৯৪৪ সালের ১৩ মে যশোরে জন্ম তাঁর; পৈতৃক শিকড়ও সেখানে। কিন্তু বেড়ে ওঠার সময়ের অনেকটাই কেটেছে বরিশালে—পিতার সরকারি চাকরির স্থানিক বাধ্যবাধকতায়। সুরাইয়া খানমের সাহিত্যপ্রেমের নেপথ্যে পারিবারিক প্রেক্ষাপট কতটা ভূমিকা রেখেছিল, তা তাঁর নিজের বয়ানেই জানতে পারি। মা শওকত আরা খানম ও বাবা মো. বজলুর রহমান খান দুজনেই বই আর সাময়িকপত্র পড়তে ভালোবাসতেন; ছোটবেলা থেকেই কবিতা লেখার শুরু, 'অঙ্ক

কষার খাতা কবিতায় ভর্তি থাকায় তিরস্কারও জুটত বাড়িতে। তবে অভিভাবকেরা উৎসাহ দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্য পাঠে। কৈশোরে কবিতা লেখার কারণে বকা দিলেও মা-বাবাকে শেষ অবধি নিজের কবিতার আদি উৎস ও অনুপ্রেরণা বলে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা রাখেননি সুরাইয়া। অনুরূপ প্রেরণা তাঁর অগ্রজ সহোদরা কথাসাহিত্যিক দিলারা হাশেমকেও ভবিষ্যতে লেখক হতে সাহায্য করেছিল নিশ্চয়ই। মাধ্যমিক পরীক্ষায় তদানীন্তন ঢাকা বোর্ডে ছেলে-মেয়ের যুগ্ম তালিকায় নবম স্থান পান। পাস করার পর পিতার বদলিজনিত কারণে তাঁর পড়াশোনার বাকি পর্যায় সম্পন্ন হয় তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি শহরে। সেখানেও সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকে—আইএতে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়, অনার্সে প্রথম এবং এমএতে ফার্স্ট ক্লাস পান। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি নিয়ে পড়ার সময় তাঁর কিছু ইংরেজি লেখাজোখা প্রকাশ পায় সেখানকার সাহিত্য-শিল্প বিষয়ক একটি ইংরেজি পত্রিকা *Vision*-এ। ১৯৬৭ সালে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়ে পড়তে যান যুক্তরাজ্যে, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে 'ট্রাইপস' বা 'ট্রিপল অনার্স' ডিগ্রি অর্জন করেন—ওই তিন অনার্সের বিষয় ছিল যথাক্রমে চসার (মেডিয়াভেল), এলিজাবেথান ও ফিকশন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডে সুরাইয়া খানম মুক্তিকামী বাংলাদেশের পক্ষে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছিলেন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে নানান কর্মতৎপরতায় তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। 'অ্যাকশন কমিটি ফর দ্য পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন ইউকে'র স্টিয়ারিং কমিটির তরফে বাংলাদেশকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ব্রিটিশ এমপিদের কাছে চিঠি লেখা থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন বা লেবার পার্টির বার্ষিক সম্মেলনে গিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরি করা—স্বদেশের জন্য তাঁর কর্মতৎপরতা ছিল এমনই বিস্তৃত, অক্লান্ত। আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁর *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি* (ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০) বইতে জানিয়েছেন, ১৯৭১-এর ৫ই জুন শেফিল্ড টাউন হলে বাংলাদেশের জন্য বিরাট এক সভা হয়েছিল—সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতাটি আবেগময় কণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন সুরাইয়া খানম। পূর্বোক্ত স্টিয়ারিং কমিটির তরফে পরে *বাংলাদেশ টুডে* নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি বুলেটিন বের করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, সময়ের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ওই বুলেটিনের সম্পাদকীয় কর্মকাণ্ডেও প্রভূত শ্রম দিয়েছিলেন তিনি নেপথ্যে থেকে। ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়ের খবর এলে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে আয়োজিত বিজয় উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল তাঁরই হাতে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালের প্রথম দিকেই সুরাইয়া ঢাকায় ফিরে আসেন। পরে, ১৯৭৪-এ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তবে তাঁর বাংলা লেখালেখি পুরোদমে ও অনেকটা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে যায় বাহাত্তরেই। দৈনিক *বাংলায়* ওই বছরের মে মাসে

প্রকাশ পায় তাঁর একটি গদ্য, যা এখন অবধি প্রাপ্ত তাঁর সবচেয়ে পুরনো মুদ্রিত বাংলা লেখা। পরে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এবং বাংলা একাডেমির সাহিত্যপত্র *উত্তরাধিকার* কি সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*য় দেখা মিলছে তাঁর তরতাজা সব কবিতার; কখনো আবার করছেন ভিনদেশি কবিতার বঙ্গানুবাদ। এর মধ্যেই কবি আবুল হাসানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও প্রণয়ের পর্বটি ঘটে যায়। যা পরে বাংলাদেশের সাহিত্যজগতে যুগ যুগ ধরে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠবে, নিটোল বাস্তবতা ছাপিয়ে নানান কল্পকথার ডালপালাও সৃষ্টি হতে থাকবে এই অপরূপ প্রেমোপাখ্যানটিকে ঘিরে। সেসব কল্পকথার কিছু স্বপ্নাতুর, কিছু কদর্য। ১৯৭৫-এর ২৬ নভেম্বর আবুল হাসানের করুণ অকালমৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগেই বেরিয়েছিল হাসানের তৃতীয় ও অন্তিম কাব্যগ্রন্থ *পৃথক পালঙ্ক*, যার উৎসর্গপত্রে নিরাভরণভাবে মুদ্রিত একটি অনিবার্য নাম শুধু—সুরাইয়া খানম। স্বদেশের অস্থির অবস্থা ও আবুল হাসানের প্রয়াণ-পরবর্তী বেদনার অভিঘাতমুখর কালপর্বেই—ঠিক এর পরের বছর, ১৯৭৬-এর জুন মাসে প্রকাশ পায় সুরাইয়া খানমের প্রথম ও একমাত্র কাব্যগ্রন্থ *নাচের শব্দ*। আর এর উৎসর্গপত্রে যথারীতি আরেকটি অনিবার্য নাম, একইরকম নিরাভরণ আকারে—আবুল হাসান। কাকতালীয়ভাবে, এই দুটি কাব্যগ্রন্থই প্রকাশ পেয়েছিল গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের সন্ধানী প্রকাশনী থেকে; দুটিরই প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী।

নাচের শব্দ প্রকাশ পাবার পরপর সুরাইয়া খানমের কবিতা লেখা থেমে থাকেনি। জাতীয় দৈনিকের সাহিত্যপাতা, বিশেষ সংখ্যা কিংবা বারোয়ারি সাপ্তাহিক থেকে শুরু করে মফস্বলের লিটল ম্যাগাজিন—সর্বত্রই তাঁর কবিতা তখন প্রকাশ পাচ্ছে। কবিতা অনুবাদের কাজে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা—বিদেশি কবিতার বাংলা অনুবাদের পাশাপাশি বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদও তখন করেছেন। শহর ঢাকার জমজমাট কবিতাপাঠের অনুষ্ঠান কি জেলা পর্যায়ের মফস্বলীয় সাহিত্যসভা—তাঁর সরব উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে নানান পরিসরে। ১৯৮১-র শেষের দিকে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ পাবার পর সুরাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাট চুকিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হন ১৯৮২-র প্রথমার্ধে। ফুলব্রাইট স্কলার হিসেবে অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে ইংরেজি সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি পান। আরও পরে, ১৯৯৮ সালে 'Gender and the Colonial Short Story' শীর্ষক গবেষণাপত্রের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কিন্তু, দেশে আর ফেরা হয়নি তাঁর। উচ্চতর শিক্ষার এই দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হলে তিনি অ্যারিজোনার টুসান শহরে থেকে যান, ওই অঙ্গরাজ্যেরই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন বেশ কয়েক বছর। ভিনদেশে থিতু হলেও বাংলা ভাষায় লেখালেখি একেবারে থামিয়ে দেননি। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত কিছু পত্রিকায় তাঁর কবিতা ও গদ্য অনিয়মিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উত্তর আমেরিকার বাঙালি কমিউনিটি আয়োজিত সাহিত্য-শিল্প সংক্রান্ত সেমিনার, কবিতাপাঠের আসর ও বইমেলায় তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন বলেও জানা যায়। ২০০৬ সালের ২৬ মে টুসানেই ৬৪ বছর বয়সে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় সুরাইয়া খানমের মৃত্যু হয়।

২.

নাচের শব্দ-এর পৃষ্ঠপ্রচ্ছদে প্রকাশকের তরফে মুদ্রিত হয়েছিল নিম্নোক্ত শংসাবচন : ‘সুরাইয়া খানমের কবিতা মরচে পড়া গানের গুচ্ছ নয়। এই ভণ্ড, শ্বাসরুদ্ধকারী সমাজের জরাজীর্ণ দুর্গে সরাসরি আঘাত হেনেছেন তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ, বিন্যস্ত শব্দাবলী দিয়ে। মানবসত্তার বাণিজ্যিক লেনদেন তাঁকে পীড়িত, উদ্‌ভ্রান্ত করে, নির্মানুষ নিসর্গ তাঁর কাছে অবান্তর, অর্থহীন। নিজের কাছে সৎ থাকার জন্যে, সত্যকে নিরাবরণ করার জন্যে কবিতা লেখেন সুরাইয়া খানম। জন-মানুষের সঙ্গে তাঁর ক্রুদ্ধ, অতৃপ্ত, অনমনীয় আত্মার অকৃত্রিম সংলাপ তাঁর কবিতাগুচ্ছ। সমকালীন বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল সংযোজন তাঁর নাম, তাঁর কবিতা।’

বইয়ের পরিচিতিরূপে লেখা হলেও এ মন্তব্য স্বল্প পরিসরেই সুরাইয়ার কবিতার শক্তিমত্তা, বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্যকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর কবিতার সত্যিকারের অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ সমকালে অন্তত হয়নি। *নাচের শব্দ* প্রকাশ পাবার পর শুধু দৈনিক *সংবাদ*-এর সাহিত্যপাতায় সন্তোষ গুপ্ত লিখেছিলেন এক বিমিশ্র সমালোচনা (১ আগস্ট ১৯৭৬)। বইটির কোনো কোনো কবিতাকে তাঁর ‘অন্যমনস্ক কাউকে চড়াসুরে ধমক দিয়ে ভালো গান শোনানোর প্রচেষ্টা’ মনে হলেও আবার এর কিছু কবিতাকে যে ‘চমৎকার বললেও কিছুই বলা হয় না’ কিংবা বইটির অনেক কবিতার মধ্যে ‘ছন্দের ঝংকারের সঙ্গে আধুনিকতার সখ্য নিবিড়’ এও তিনি স্বীকার করেছেন। এ আলোচনা নিতান্তই তাৎক্ষণিক। ‘নাচের শব্দ’—এই নামকরণের নেপথ্যেই যে এক স্বতন্ত্র ভঙ্গিমা উপস্থিত তা বইটির প্রকাশমুহূর্তে কেউ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। কবি রুবী রহমান সুরাইয়ার মৃত্যু-পরবর্তী এক শ্রদ্ধালেখে এই নামকরণের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যে মন্তব্যটি করেছিলেন, তা এক্ষেত্রে গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে—‘বইয়ের নাম *নাচের শব্দ*, নাচের নিক্কণ নয়, নাচের ধ্বনি নয়। নাম নির্বাচনে রয়েছে সেই দার্ঢ্য, যা সুরাইয়ার শিল্পরুচির মূল উপাদান।’ (‘পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো’; তৃতীয় বর্ষ অষ্টম সংখ্যা : সেপ্টেম্বর ২০০৬, *কালি ও কলম*) উল্লেখ্য, *নাচের শব্দ* ছেপে বেরোবার মাস ছয় আগে সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*র ‘বাংলাদেশের কবি ও কবিতা’ সংখ্যায় সুরাইয়ার একটি কবিতার সঙ্গে তাঁর প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থের নাম হিসেবে লেখা হয়েছিল ভিন্ন একটি নাম—‘অভিমানের বাঁশী’। তবে *নাচের শব্দ* নামটি শেষমেশ চূড়ান্ত করাটা যে শিল্পসম্মত সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল তা এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

নাচের শব্দ প্রকাশ পাবার পর সুরাইয়া খানম একাধিক কাব্যগ্রন্থ নির্মাণের পরিকল্পনা যে করছিলেন, তার প্রমাণ নানা জায়গায় মেলে। নিউইয়র্কে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও পূরবী বসু দম্পতির গৃহে এক আড্ডায় তিনি জানিয়েছিলেন, সপ্তক ওসমান সম্পাদিত ছোটকাগজ *সংলাপ*-এ ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত তাঁর কবিতা ‘কালো মানুষের ক্বাসিদা’র শিরোনাম সামনে রেখে একটি কবিতার বই তিনি তৈরি করতে চান। এই সম্ভাব্য পাণ্ডুলিপির বাইরে থাকা কবিতা নিয়ে ‘বীজতলার গান’ ও ‘গোরখোদকের

সংলাপ’ শিরোনামে আরও দুটি বই হতে পারে, এমনও বলেছিলেন (‘অপ্রকাশিত সুরাইয়া’; ১২ অক্টোবর ২০২২, *আজকের পত্রিকা*)। পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ কাব্যগ্রন্থগুলো সুরাইয়া খানম পরে গুছিয়ে যেতে আর পারেননি। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ ও একমাত্র বই হিসেবে কেবলই *নাচের শব্দ* থেকে গেল।

নিজের নির্মাণ-সম্ভব কবিতাবইয়ের সংখ্যা নিয়ে স্বয়ং সুরাইয়া খানমই যা বলে গেছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে তাঁর অগ্রন্থিত কবিতার সংখ্যা নেহাত কম নয়। গবেষক ইসরাইল খান ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে জার্নিম্যান বুকস থেকে *নাচের শব্দ*-এর অন্তর্গত ৫১টি কবিতার সঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত তাঁর অগ্রন্থিত আরও ৩৩টি কবিতা যুক্ত করে নিজের সম্পাদনায় *সুরাইয়া খানমের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতা* শীর্ষক একটি সংকলন প্রকাশ করেন। সুরাইয়ার এতগুলো অগ্রন্থিত কবিতা পাঠকের সামনে আনার জন্য ইসরাইল খান আমাদের ধন্যবাদ অবশ্যই পাবেন। তা সত্ত্বেও বলতে হয়, ওই সংকলনটি সম্পাদনা ও বিন্যাসের দিক থেকে একাধিক দুর্বলতায় আক্রান্ত। অগ্রন্থিত পর্যায়ের কবিতাগুলো সাজানো হয়েছে প্রচণ্ড এলোমেলোভাবে, কালানুক্রম মানা হয়নি। প্রমাদকণ্টকিত ছাপাও পীড়া দেয়। উপরন্তু, ভূমিকায় ইসরাইল খান কিছু গুরুতর ভুল তথ্য দিয়েছেন। যেমন—সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত *সমকাল* পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধপূর্ব সময়পর্বে সুরাইয়া খানমের কবিতা ছাপা হয়েছিল, এ তথ্যের সারবত্তা নেই। খোদ ইসরাইল খানের বই *পূর্ব বাঙলার সাময়িকপত্র : প্রগতিশীল ধারা* ১৯৪৭-৭১-তে (বাংলা একাডেমি, ২০১৬) *সমকাল*-এর যে রচনাপঞ্জি লভ্য, সেই পঞ্জি সাক্ষ্য দিচ্ছে—পাকিস্তানি জামানায় ছাপা হওয়া পত্রিকাটির সংখ্যাগুলোর কোনোটিতেই সুরাইয়ার কবিতা প্রকাশ পায়নি। বাহাত্তরে দেশে ফেরার পর *সমকাল*-এ তাঁর কবিতা প্রকাশ পেতে শুরু করে।

৩.

উত্তরপ্রজন্মের কাছে সুরাইয়া খানমের কবিতার স্বাদ পূর্ণাঙ্গরূপে পৌঁছে দেওয়া ও তাঁর তাবৎ লেখালেখির একটি অখণ্ড (যতখানি আপাতত সম্ভব) আকর তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা নির্মাণ করেছি এই সংকলন, *সুরাইয়া খানম সমগ্র*। এখানে রইল *নাচের শব্দ*-এর ৫১টি কবিতা, *সুরাইয়া খানমের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতা* সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ৩৩টি অগ্রন্থিত কবিতা এবং এই সংকলনের সবিশেষ সংযোজন, সম্প্রতি খুঁজে পাওয়া সুরাইয়া খানমের আরও ৩২টি অগ্রন্থিত কবিতা। মোটমাট সব মিলিয়ে এই সংকলনে একত্রিত হলো সুরাইয়া খানমের ১১৬টি কবিতা।

সুরাইয়া খানমের কবিসত্তার পাশাপাশি তাঁর অনুবাদক ও গদ্যলেখক পরিচয় অনেকটা প্রথমবারের মতো এ সংকলনে উপস্থাপিত হলো। ওয়ালেস স্টিভেন্স, ডি এইচ লরেন্স, পাবলো নেরুদা, ডব্লিউ এইচ অডেন ও লিওপোল্ড সেদার সেঙ্ঘরের কবিতার সুরাইয়াকৃত বঙ্গানুবাদ নিঃসন্দেহে তাঁর মৌলিক কবিতার মতোই পাঠকদের

ভালো লাগবে। সঙ্গে আরও আছে তাঁর করা বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ—যথাক্রমে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও আলতাফ হোসেনের দুটি কবিতার। কবিতার পাশাপাশি সুরাইয়া খানম চমৎকার গদ্যও লিখতেন। আফসোসের বিষয়, তাঁর খুব বেশি গদ্য আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। তাঁর তিনটি ছোটবড় প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও একটি চিঠি রইল এই বইয়ের 'গদ্য' পর্যায়ে। সবশেষে আছে তাঁর চারটি চমৎকার সাক্ষাৎকার। সুরাইয়ার সাহসী মন, উচ্ছল চিত্ত ও অগাধ অথচ অস্থির পাণ্ডিত্যের পরিচয় এসব আলাপচারিতার মধ্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে। পূর্বোক্ত কাব্যানুবাদগুচ্ছ, গদ্য চতুষ্টয় এবং চারটি সাক্ষাৎকার এতদিন অগ্রন্থিতই ছিল।

সুরাইয়া খানমের আরও কিছু কবিতা কিংবা অন্যান্য রচনা আমাদের সংগ্রহের বাইরে থেকে গেছে নিশ্চিতভাবেই। সাহিত্য-গবেষক ও পাঠকদের সহায়তা এক্ষেত্রে আমাদের কাম্য। ভবিষ্যতে সুরাইয়া খানমের আরও অগ্রন্থিত লেখা পেলে এ সংকলনের পরের সংস্করণে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করার আশা রাখি।

৪.

সুরাইয়া খানম সমগ্র-এর নির্মাণ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে কী কী সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা হয়েছে, তার একটা বিবরণ এখানে দেওয়া দরকার।

নাচের শব্দ কাব্যগ্রন্থটির ক্ষেত্রে আমরা অনুসরণ করেছি বইটির প্রথম সংস্করণের পাঠ। ইসরাইল খানের জোগাড় করা, *সুরাইয়া খানমের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতা* সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ৩৩টি 'পুরাতন' অগ্রন্থিত কবিতা আমাদের সংগ্রহকৃত 'নতুন' ৩২টি অগ্রন্থিত কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে 'অগ্রন্থিত কবিতা' শিরোনামের একটি অংশে এখানে ছাপাবার কথা প্রথমে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু পরে দুটি পর্যায় আলাদাভাবে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ, এতে করে অগ্রজ গবেষকের শ্রমকে সহজেই আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে। ইসরাইল খান সংগৃহীত অগ্রন্থিত কবিতাগুলোর বিন্যাস *সুরাইয়া খানমের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতা* বইতে যেভাবে ছিল সেভাবে অবশ্য এ সংকলনে রাখা হয়নি। এখানে কবিতাগুলো সাজানো হয়েছে প্রথম প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী। মুদ্রণপ্রমাদও যতটা পারা যায় শুধরে নেওয়া গেছে; নথিপত্র ঘেঁটে একটি কবিতার প্রথম প্রকাশের পূর্বে লিখিত সময়কাল সংশোধন করা হয়েছে। তবে পাঠকদের বুঝবার সুবিধার জন্য বর্তমান সংকলনে ইসরাইল খান সংকলিত কবিতাগুলো ছাপা হয়েছে 'সুরাইয়া খানমের কবিতা' শিরোনামের একটি বিভাগে, সূচিপত্রেও অংশটির নাম ওভাবেই রাখা রয়েছে; স্রেফ বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য *সুরাইয়া খানমের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতা* বইটির নাম আমরা খানিক বদলে নিতে বাধ্য হয়েছি এ ক্ষেত্রে। আশা করি পাঠকেরা এ সিদ্ধান্ত ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমাদের উদ্যোগে প্রাপ্ত অগ্রন্থিত কবিতাগুলো রইল 'অগ্রন্থিত কবিতা' অংশে, যা যথারীতি সেখানে কালানুক্রমিক আকারে বিন্যস্ত হয়েছে। সুরাইয়া খানমের ব্যক্তিগত বানানরীতি যতটা পারা যায় অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছি।

এই সংকলন নির্মাণের কাজে আন্তরিক সহায়তা পেয়েছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও পাঠকক্ষের কর্মীদের কাছ থেকে, তাঁদের সাহায্য ছাড়া বহু জীর্ণ দৈনিক ও সাময়িকীর পাতা ঘেঁটে সুরাইয়া খানমের অগ্রন্থিত রচনা উদ্ধারের কাজটি সহজ হতো না। বাংলা একাডেমির সাহিত্যপত্র *উত্তরাধিকার*-এ প্রকাশিত সুরাইয়া খানমের অগ্রন্থিত কবিতা ও অনুবাদ কবিতাগুলো সংগ্রহ করে দিয়েছেন কবি পিয়াস মজিদ। সুরাইয়া খানমের লেখা চিরকুট, টুকরো মন্তব্য আর বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য ও ছবি দিয়েছেন কবি-কথাসাহিত্যিক মোশতাক আহমদ। সুরাইয়া খানম ও সত্তরের দশকের ঢাকার সাহিত্যজগতের সম্পর্কের আগাপাশতলা বুঝে নেবার জন্য বারবার শরণাপন্ন হয়েছি অধ্যাপক রফিক কায়সারের। সুরাইয়া খানমের মার্কিনজীবনের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ বুঝে নেবার জন্য কথা বলেছি নিউইয়র্কবাসী প্রাবন্ধিক-গবেষক আহমাদ মাযহারের সঙ্গে। এঁদের কারও সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক নিছক কেতাবি নয়।

৫.

১৯৭৬ সালে প্রকাশিত এক কবিতায় সুরাইয়া খানম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'আমি আজও সম্পূর্ণ সুরাইয়া হয়ে উঠিনি, জনাব।/আজও আমি ক্রমাগত ক্রমান্বয়ে হয় এর মাপ/নয় ওর ছাপ।/...সমস্ত শরীর, কিংবা শরীরের খোলসের/আড়ালে শরীর ভরে ফুটে ওঠা/পাপে তাপে আকীর্ণ অক্ষরভরা অচিন সংলাপ...'। সেই 'সম্পূর্ণ সুরাইয়া'কেই আমরা এই সংকলনের মধ্য দিয়ে পেতে চেয়েছি।

জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরেও সুরাইয়া খানমকে বহু অযাচিত অসার সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। বছর কতক আগে, প্রয়াত কবি মোহাম্মদ রফিক আবুল হাসানকে নিয়ে স্মৃতিকথা রচনার সময় এক অসম্ভবের সাক্ষ্য দিয়ে সুরাইয়াকে আক্রমণ করে অত্যন্ত কটুভাষায় লিখেছিলেন : '...আমার তো আগে থেকেই ধারণা ছিল ও [সুরাইয়া খানম] কিছু লেখে না। অন্যের লেখা সে বই আকারে বের করেছে। আর লেখার জন্য যে স্থিতিটুকু দরকার সুরাইয়ার সে স্থিতিটুকুও কখনো ছিল না।... কোনোদিন ও কবিতা লেখেনি। কোথাও এক লাইন সে লিখেছে সেরকম কোনো ইতিহাস নেই। কারো যদি লেখালেখির অভ্যাস থেকে থাকে তাহলে কি সে না লিখে থাকতে পারে? ওর যে বইটা বেরিয়েছে, সেটা [আবুল] হাসানের ঐ কবিতাগুলো দিয়ে বের করেছিল।...' ('আবুল হাসানের কবিজীবন ও সুরাইয়াকে ঘিরে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান সম্পর্কে'; বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২০ : জুন ২০১৬, *শালুক*) সম্পর্কের ব্যক্তিগত টানাপোড়েন থাকতেই পারে, তাই বলে আবুল হাসানের কবিতা সুরাইয়া খানম 'আত্মসাৎ করেছেন' এমন ভিত্তিহীন কাল্পনিক অভিযোগ! এমন কদাকার মিথ্যার বিপরীতে এই ভূমিকার অন্তে উদ্ধৃত করি আবুল হাসানের *পৃথক পালঙ্ক* থেকে 'মীরা বাঈ' কবিতার অংশবিশেষ—যে কবিতার আত্মায়, শরীরে, পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে

আছেন স্বয়ং সুরাইয়া—কাব্যদেবীর প্রদত্ত অগ্নিপরীক্ষায় যিনি বারংবার পরিশুদ্ধ, শত অযাচিত অপমান কাঁধে নিয়েও তিনি যেন নিজেই আর-এক জো'ন অব আর্ক—

...যখোন জীবন কাঁটা রাখে তার পথে পথে
সে তখোন পায়ের তলায় বিদ্ধ ব্যথা নিয়ে নতুন নিয়মে পুষ্পিত।

ভুল বোঝে লোকে, ভাবে গরবিনী অথবা অস্থির অভিমানী :
কিন্তু আমি জানি তার হাতের উপর কেন উড়ে আসে
আহত পাখির দল, মানুষ, মলিন চাষা, চিৎকৃত প্রসূন!

ভিতরে বিশাল এক মমতাক্ষমতা, জানে যুঁইফুল মাটির তলায়
কিসের আবেগে বাড়ে—কতটুকু সান্ত্বনায় শিকড়প্রবাহে জাগে
পৃথিবীতে আজো সব ভালোবাসা, স্নেহ, প্রেম, শুভতা, শুভ্রতা।

নিজেই আহত : তবু লোকে ভাবে রয়েছে লুকোনো তার মুঠোর ভিতর
কালকেউটের ঝাঁপি, লোহার করাত, ছুরি, ঘাতকের বিষ!

সে তার সুন্দর পোড়ে আর ওরা ভাবে দেখো জ্বালালো আগুন!...

প্রিয় পাঠক—বাংলা কবিতার এই দুঃখিনী, নিঃসঙ্গ রাজকন্যাকে এবার আপনারা আপন করে নিন।

মুহিত হাসান
৩০ জুন ২০২৫
রাজশাহী

সূচিপত্র

নাচের শব্দ [১৯৭৬]
ভ্রষ্টলগ্নে ম্যানিফেস্টো ২৭
শব্দরথী ২৮
অরফিউসের প্রতি গান ২৯
তৃতীয় বিশ্ব ৩০
এখানে আতর পাওয়া যায় ৩১
প্রশ্ন ৩২
চন্দ্রমেহন ৩৩
পঙ্খিরাজের বাতাস কাটা ৩৪
দেখা ৩৫
ছেঁড়া শাড়ি ৩৬
অন্য কথা ৩৭
শুশ্রূষাগার ৩৮
বাঘ ও মানুষ ৩৯
অমর পূর্ণিমা ৪০
অহংকার ৪১
তলোয়ার ৪২
শঙ্খধ্বনি ৪৩
নিঃসঙ্গ ভ্রমণ ৪৪
দহন ৪৫
বাঘ ও হরিণ ৪৬
মধ্যবিত্ত সমাচার ৪৭
রক্ত ৪৮
দেবতার আহার ৪৯
সবুজ নাগরা ৫০
মায়া কানন ৫১
পোড়া রুটি ৫২
বার্টার ৫৩

লেন-দেন ৫৪
মোহন ৫৫
মোহক্ষরণ ৫৬
দরোজাটা কোথায় ৫৭
ও ঘূর্ণি ও জলোচ্ছ্বাস ৫৮
হলদে লতা ৫৯
খাজনা ৬০
ফেরিঅলা ৬১
সোনালি মাছ ৬২
পা ৬৩
বিলুপ্ত নক্ষত্র ৬৪
ইনটেরোগেশন ৬৫
আত্মলীনা ৬৬
হিসাব ৬৭
ঝুলন্ত পেরেক ৬৮
বাগান ৬৯
সেফটিপিন ৭০
প্রতিবাদ ৭১
নাচের শব্দ ৭২
দলিল ৭৩
পিতৃপুরুষ ৭৪
ভিন্ন দৃষ্টি ৭৫
গণৎকারকে ঋনৎকার ৭৬
মাতৃবন্দনা ৭৭

সুরাইয়া খানমের কবিতা [২০২৩]
হারিকিরি শপথ ৮৩
বিশ্বপিতার প্রতিকৃতি ৮৪
আমি আজও সম্পূর্ণ সুরাইয়া হয়ে উঠিনি ৮৬
শ্যাওলা জড়ানো কানে ৮৭
কবিতা এবং সংক্রমণ ৮৮
প্রতিদান ৮৯
তোমাদেরই ছেড়েদি আসন ৯০
কোনো কবিতা নয় ৯১
কালো মানুষের ক্বাসিদা ৯৩
তবু চাই ৯৪